স্মার্টফোন যখন ক্ষতির কারণ

মেহেদী হাসান

বাংলার ঘরে ঘরে তখন সবে টেলিভিশন আসতে শুরু করেছে। মানুষ কত আগ্রহ, কত উদ্দীপনা নিয়ে টেলিভিশনের অনুষ্ঠান দেখত। একটি চলচ্চিত্রের জন্য পুরো সপ্তাহ অপেক্ষায় থাকত। স্যাটেলাইট চ্যানেল আসার পর থেকে সেই উদ্দীপনা কমে গেলেও কিছু কিছু মানুষ টেলিভিশনের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ল। বিদেশী সংস্কৃতি তাদের বেশি আকৃষ্ট করল। আজকাল শোনা যাচ্ছে, এই টেলিভিশনের অনুষ্ঠানের জন্য বিবাহ-বিচ্ছেদ বেড়ে গেছে। মানুষের মাঝে কথায় কথায় আত্মহত্যার প্রবণতা বাড়ছে।

টেলিভিশনের পর সবার ঘরে পৌঁছে গেল কমপিউটার। অপার সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিল আমাদের সামনে। হেন কাজ নেই যা এতে করা যায় না। মানুষের কর্মদক্ষতা বাড়িয়ে দিল। টেলিভিশনের একমুখী যোগাযোগের ধারা পাল্টে উভয়পক্ষকে নিজের মতামত প্রকাশের সুযোগ করে দিল। ঘরে বসেই সবার সাথে যোগাযোগ রাখতে শুরু করল মানুষ। ফেসবুক কিংবা স্কাইপের মতো যোগাযোগের মাধ্যমগুলো দিনরাত ২৪ ঘণ্টা যোগাযোগের সুযোগ করে দেয়ার পরও মানুষ কিন্তু আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ল। সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমগুলো আমাদের একরকম সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিল। বৃদ্ধ বাবা-মাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা কিংবা কারও বিয়ের খবরে অভিনন্দন জানাচ্ছি ইন্টারনেট বা ফোনে। পাশের বাড়ির লোকগুলো অচেনা হয়ে পড়ল। ঘরে বসেই যখন সব কাজ হচ্ছে, তখন বের হওয়ার দরকার কি– এমন মনোভাব চলে এলো আমাদের মাঝে। সবাই সেটা মেনেও নিলাম। এরপর কমপিউটারের আকার পাল্টে গেল। ঘরে ঘরে থেকে এখন হাতে হাতে পৌঁছে গেলও স্মার্টফোন। অন্যভাবে বলতে গেলে ক্ষুদে কমপিউটার। এবার আর পাশের বাড়ি নয়। নিজের ঘরের লোকগুলোকেই অচেনা করে দিল। স্মার্টফোন সহজে বহনযোগ্য হওয়ায় এক মুহূর্ত সময় 'নষ্ট' করতে আমরা আপত্তি জানালাম। মুখোমুখি কথোপকথনের সময় কিংবা খাবার টেবিলে তো বটেই। এমনকি বাথরুমে কিংবা বিছানায় পৌঁছে গেল স্মার্টফোন। সারাক্ষণ এসএমএস, ই-মেইল, সোশ্যাল নেটওয়ার্কে এত ব্যস্ত হয়ে পড়ায় পাশের মানুষটির খবর নেয়ার সময়টুকু আমাদের হাতে এখন নেই।

প্রযুক্তি আমাদের আধুনিক করছে বটে। তবে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলছি আমরা। স্মার্টফোন ছাড়া একটা দিন দূরের কথা, কয়েক মুহূর্ত দূরে থাকতে পারছি না। আপনি নিজেই চিন্তা করে দেখুন, এই লেখাটা পড়ার আগে গত এক ঘণ্টায় প্রয়োজন ছাড়া স্মার্টফোন কিংবা কমপিউটারে কতবার হাত দিয়েছেন? একবার সিনেমা হলের অন্ধকার ঘরে হঠাৎ দেখি পাশ থেকে আলো জ্বলে উঠল, নিজের বন্ধু ছিল। জিজ্ঞেস করতেই জানলাম সিনেমা দেখার পাশাপাশি সে ফেসবুক ঘেঁটে দেখছে। আশপাশে তাকাতে আরও ৯ বা ১০টা মোবাইল ফোনের আলো দেখতে পেলাম।

ড্রাইভ করার সময় এই ঘটনা আজকাল অহরহ ঘটছে। যদি একটি দুর্ঘটনা ঘটে? একটি দুর্ঘটনা কি শুধু নিজের ক্ষতির কারণ? অপরদিক থেকে আসা যে লোকটি মনোযোগের সাথে গাড়ি চালাচ্ছিল। আপনার নিয়মভঙ্গের জন্য তো তারও মৃত্যু হতে পারে। সে দায় কে নেবে? প্রার্থনার কক্ষে আপনি বিরক্ত করছেন সবাইকে। সারাদিনের পর রাতের খাবার টেবিলে নিজের পরিবারকে সঙ্গ দেয়ার বদলে সেখানেও মোবাইল ফোনে 'সামাজিকতা' রক্ষা করছে সবাই। সারা বিশ্বের সাথে যোগাযোগ রাখতে গিয়ে আপন মানুষটির সাথে যোগাযোগ হারিয়ে ফেলছে সবাই।

স্মার্টফোনের ভালো দিকগুলোর তালিকা যথেষ্ট লম্বা। খুবই প্রয়োজনীয় এবং উপকারী একটি ডিভাইস। অনেকের কাছে বন্ধুর মতো। আমাদের দৈনন্দিন জীবনটাকে কত সহজ করে তুলেছে! কিন্তু উপরে উল্লিখিত সময়গুলোতে কি আমরা আমাদের স্মার্টফোনগুলো দূরে রাখতে পারতাম না? কিছুটা সময় নিজের জন্য, নিজের পরিবারের জন্য রাখা উচিত। সর্বোপরি, এই প্রযুক্তির ভিড়ে নিজেকে, নিজের আত্মাকে হারিয়ে ফেলা উচিত হচ্ছে না। আরও সহজভাবে বলতে গেলে, স্মার্টফোন থেকে নয় বরং স্মার্টফোন আসক্তি থেকে নিজেকে দূরে রাখুন। মানুষের অন্যান্য ব্যাধির মতো এই আসক্তি শারীরিক দিক থেকে না হোক, মানসিক দিক থেকে ক্ষতি করছে, নির্ভরশীল করে তুলছে আমাদের। অনেক সময় তো এটা মাদক সেবনের চেয়েও ভয়ঙ্কর।

ব্যাংক অ্যাকাউন্ট দেখার জন্য, সোশ্যাল নেটওয়ার্কে খবরাখবর পাওয়ার জন্য, প্রিয়জনকে শুভেচ্ছা জানানোর জন্য কিংবা যোগাযোগ রক্ষার জন্য আমরা স্মার্টফোনের ওপরে এতটাই নির্ভরশীল হয়ে পড়েছি যে তা যদি হারিয়ে যায়, নিদেনপক্ষে কিছুটা সময় হাতের নাগালের বাইরে থাকলেই আমরা চিন্তিত হয়ে পড়ি, উত্তেজিত হয়ে উঠি। ফোন হারিয়ে গেলে তো মানুষ উত্তেজিত হবেই। কিন্তু এই উত্তেজনার বিষয় কোনো দামি কিছু হারিয়ে যাওয়া নয়। মানুষের মাঝে একটা ভয় চলে আসে এই ভেবে, যে কাজগুলো আমি স্মার্টফোনে করতাম তা এখন কীভাবে করব! আমার দরকারি তথ্যগুলো যে মোবাইল ফোনে আছে! কীভাবে সবার সাথে যোগাযোগ রাখব! কীভাবে এটা করব, ওটা করব ইত্যাদি। মানুষের নানা ধরনের ভয়গুলোকে নানা ধরনের ফোবিয়া দিয়ে চিহ্নিত করা হয়। মজার ব্যাপার এবং একই সাথে ভয়ঙ্কর ব্যাপার হচ্ছে মোবাইল ফোন থেকে দূরে থাকার জন্য মানুষের মনে যে ভয়ের সৃষ্টি হয়, তার জন্যও একটা নাম দেয়া হয়েছে– নোমোফোবিয়া। 'নো মোবাইল ফোবিয়া'র সংক্ষিপ্ত রূপ এটি।

হার্ভার্ড বিজনেস স্কুলের কোনোসুকি মাতসুশিতা অধ্যাপক লেসলি পারলো একবার ১৬শ' জন ব্যবস্থাপক ও নির্বাহীর সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন। সেই ১৬শ' জনের ৭০ শতাংশ জানিয়েছিলেন তারা ঘুম থেকে জাগার এক ঘণ্টার মাঝেই স্মার্টফোন ব্যবহার করেন। ঘুমাতে যাওয়ার আগে এক ঘণ্টার মাঝে ব্যবহার করেন ৫৬ শতাংশ। সপ্তাহান্তে অর্থাৎ শুক্র ও শনিবার ▸

ব্যবহার করেন ৪৮ শতাংশ। ছুটির সময়গুলোতে ব্যবহার করেন ৫১ শতাংশ। এই ১৬শ' জনের ৪৪ শতাংশ বলেছেন তাদের ফোন হারিয়ে গেলে তারা খুব ব্যাকুল হয়ে পড়বেন, অর্থাৎ নোমোফোবিয়া। এটা পশ্চিমা দেশগুলোর কাহিনী। ওরা ছুটির দিনগুলোতে সাধারণত কোনো কাজ করে না। তারপরও এই অবস্থা। আমাদের দেশে কিন্তু কেউ ছুটিছাঁটা মানে না।

আরেকটি মজার ব্যাপার হচ্ছে ধূমপানমুক্ত এলাকার মতো আজকাল সেলফোনমুক্ত এলাকা ঘোষণা করা হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায়। মানে সেই এলাকাগুলোতে আপনার মোবাইল ফোন ব্যবহারে যেনো অন্য কেউ বিরক্ত বোধ না করে সেজন্যই এই ব্যবস্থা। গুরুত্বপূর্ণ মিটিংগুলোতে স্মার্টফোনের যেকোনো ব্যবহারই নিষিদ্ধ করা হচ্ছে।

কিছুটা স্বস্তির কথা এই, আমাদের দেশে এখনও স্মার্টফোন আসক্তি এবং এর ফলে সৃষ্ট নোমোফোবিয়া মারাত্মক আকার ধারণ করেনি। তবে ধীরে ধীরে হলেও আমরা কিন্তু সেদিকেই এগিয়ে যাচ্ছি। প্রযুক্তিবিহীন একটা দিন আমরা কোনোভাবেই চিন্তা করতে পারি না। প্রয়োজনের সময় আমাদের স্মার্টফোনগুলো তো অবশ্যই ব্যবহার করব, সেটা কোনো আসক্তি বা রোগের মাঝেও পড়ে না। কিন্তু এর উল্টোটা যেনো না হয়, আমরা যেনো নির্ভরশীল না হয়ে পড়ি, যেনো অপব্যবহার না করি, তার জন্যই এই লেখা।

আপনার মাঝে যদি নিচের লক্ষণগুলো প্রকাশ পায় তো বুঝবেন আপনি স্মার্টফোনে আসক্ত।

০১. সময়ে-অসময়ে, যেখানে-সেখানে, প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে যদি বারবার ফোন চেক করেন।

০২. মোবাইলের ব্যাল্যান্স শেষ, নেটওয়ার্কের বাইরে, হারিয়ে গেছে, কিংবা কোনো কারণে স্মার্টফোনটি আপনার কাছ থেকে দূরে থাকলেই আপনি যদি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন।

০৩. মাঝে মাঝে হঠাৎ মনে হতে পারে আপনার সেলফোনে বোধহয় ভাইব্রেট হলো, আপনি চেক করে দেখলেন আসলে কিছুই নয়, মনের ভুল। যানবাহনে থাকলে এমনটা বেশি হয়। সেই বাহনের কম্পন সেলফোনের কম্পন বলে ভুল হয়।

০৪. ছাত্রছাত্রীদের জন্য এটা প্রযোজ্য। প্রযুক্তির প্রতি তারা এতটাই আসক্ত হয়ে পড়ে যে পরীক্ষার ফলাফলে তার প্রভাব পড়ে।

০৫. আপনার সামনের মানুষটি একা একাই বকবক করে যাচ্ছে। আপনি কিছু শুনছেন না, কিছু বলছেনও না। কারণ ততক্ষণে আপনার হাতে স্মার্টফোনটি চলে এসেছে এবং তাতে আপনি অকারণেই ফেসবুক খুলে বসেছেন!

০৬. মনে করুন, আপনি কোনো কাজে কিছু সময়ের জন্য বাসা থেকে বের হয়েছেন। অর্ধেক রাস্তা কিংবা প্রায় পৌঁছে গেছেন। এমন সময় মনে হলো স্মার্টফোনটি আপনি বাসায় ফেলে এসেছেন এবং আপনাকে অবশ্যই বাসায় ফিরে ফোনটি নিয়ে আসতে হবে। কিন্তু যে কাজে যাচ্ছেন তার মেয়াদ খুব অল্প এবং সেখানে স্মার্টফোনটি জরুরি নয়।

আগেই বলেছি, এটি একটি মানসিক রোগ। এর জন্য ডাক্তারের কাছে দৌড়ানোর প্রয়োজন নেই। সেখানে গিয়ে কোনো লাভও হবে না। অবস্থা খুব খারাপ না হলে মনোরোগ বিশেষজ্ঞের শরণাপন্নও হতে হবে না। আপনি নিজে যদি উপলব্ধি করেন আপনি স্মার্টফোনের প্রতি আসক্ত এবং আপনি সেখান থেকে সরে আসতে চান, তবে আপনার সদিচ্ছাটুকুই যথেষ্ট।

স্মার্টফোন ব্যবহারের সময় কিছু নিয়ম-কানুন, কিছু ভদ্রতা মেনে চলা উচিত। অন্যের সমস্যা হয় এমন কাজ সবসময় পরিত্যাজ্য, স্মার্টফোন ব্যবহারের সময়ও সেটা মাথায় রাখতে হবে। কথা বলার সময় স্বর স্বাভাবিক রাখতে হবে। উঁচু আওয়াজে কথা বললে পাশের লোকটির সমস্যা হতে পারে। অনেক মানুষের মাঝে কথা বলার সময় ব্যক্তিগত আবেগ যাতে প্রকাশ না পায়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। আপনার আশপাশের পরিবেশ মাথায় রেখে ফোনে কথা বলতে হবে। গোপনীয় কথা থাকলে সেটা সব জায়গায় বলা উচিত নয়। কোনো গুরুত্বপূর্ণ মিটিংয়ে যদি কোনো কল করা বা ধরা একান্তই জরুরি হয় তো সবার মাঝে কথা না বলে কিছুটা দূরে গিয়ে ব্যক্তিগত আলাপ সারতে হবে। ২০১৩ ইন্টারনেট ট্রেন্ড অনুযায়ী আমরা প্রতিদিন গড়ে প্রায় ১১০ থেকে ১৫০ বার স্মার্টফোন আনলক করি। গড়টাই যদি এমন হয়, তো সর্বোচ্চ সংখ্যাটা কেমন ভয়ানক হবে চিন্তা করুন।

এখানে কিছু উপদেশ দেয়া হলো, যা মানলে আপনি হয়তো এই আসক্তি কাটিয়ে উঠতে পারবেন।

০১. গাড়ি চালাবার সময় স্মার্টফোন ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন। টেক্সট করা তো একদমই যাবে না। এটাকে মনে-প্রাণে মানতে চেষ্টা করুন। যদি খুব বেশি দরকার পড়ে গাড়ি থামিয়ে, কিংবা আগে বা পরে সেই কাজটি করুন। এই একটু কাজের জন্য নিজের এবং অন্যের জীবন বিপন্ন করবেন না।

০২. অনেক সময় দেখা যায় স্মার্টফোন ব্যবহার করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েন অনেকে। এমনটা করা বাদ দিতে হবে। যদি কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ থেকেই থাকে, সেসব আগেই সেরে ফেলুন। কিংবা পরের দিনের জন্য রেখে দিন। বিছানা নিজস্ব একটি জায়গা। সেখানে যাওয়ার আগেই স্মার্টফোনটির কাজ শেষ করুন। সবচেয়ে ভালো হয় যদি বন্ধ করে রেখে দিন। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলি। একদিন কোনো কারণে রাত প্রায় ৩টার দিকে ঘুম ভেঙে গেল। ঘড়ি দেখার জন্য মোবাইলের চোখের সামনে আনার পর মনে হলো ই-মেইলটা দেখে নেই। তারপর ফেসবুক ঘাঁটলাম বেশ কিছুক্ষণ। ঘড়ি দেখে বুঝলাম প্রায় এক ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে! তারপর সারারাত আর ঘুম আসেনি। তাই এই কাজটাও করা যাবে না। বিশেষ করে যখন আপনি এই আসক্তি থেকে মুক্ত হতে চাচ্ছেন।

০৩. খাবারের দোকান কিংবা টিকেটের লাইনে কাউন্টারে দাঁড়িয়ে কখনও স্মার্টফোন ব্যবহার করবেন না। এতে নিজের পাশাপাশি বাকি লোকদেরও দেরি করিয়ে দেয়া হচ্ছে।

০৪. ফোনে কথা বলতে বলতে বাথরুমে ঢুকবেন না। কিছুটা দেরি করলে এমন কিছু অসুবিধা হবে না।

০৫. বন্ধু বা প্রিয়জনের সাথে থাকতে কার না ভালো লাগে! এই ব্যস্ত জীবনে মানুষ এমনিতেই সে সময় পায় কম। তাই যেটুকু পাওয়া যায় তা আপনার স্মার্টফোনের পেছনে ব্যয় না করে তা বন্ধ করে রাখুন। ওইটুকু সময় এমন কিছু ঘটে যাবে না, ভয় পাবেন না।

০৬. ওপরের এই কাজগুলো যখন আপনি নির্বিঘ্নে করতে পারবেন, তখন ধরে নিতে হবে স্মার্টফোন আসক্তি আপনার কমে আসছে এবং আপনি আবার আপনার নিজের জীবনের ওপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাচ্ছেন। মাঝে মাঝে ছুটির দিন বেছে নিয়ে একটা পুরো দিন প্রযুক্তির স্পর্শ ছাড়াই কাটানোর চেষ্টা করুন।

এখানে বিভিন্ন সময় ফোন বন্ধ রাখতে বলা হয়েছে। শুনতে হয়তো কিছুটা অদ্ভুত লাগতে পারে। কিন্তু আসক্তি থেকে বের হয়ে আসার জন্য কিছু ত্যাগ তো আপনাকে স্বীকার করতেই হবে। মনে রাখতে হবে, যেকোনো আসক্তি ক্ষতিকর। প্রযুক্তির আসক্তিও তাই। মানুষের দৈনন্দিন জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য আনার জন্যই প্রযুক্তি। তাই প্রযুক্তিকে নিজের কাজের জন্য ব্যবহার করতে হবে। নিজের জীবনের ওপর ছড়ি ঘোরাবার জন্য নয়। প্রযুক্তি মানুষের জন্য আশীর্বাদ। এটাকে অভিশাপে পরিণত হতে দেয়া যাবে না কজ

ফিডব্যাক : m_hasan@ovi.com